প্রোপাগান্ডা ওয়ার

মস্তিষ্ক দখলের যুদ্ধ

প্রোপাগান্ডা ওয়ার

মস্তিষ্ক দখলের লড়াই

পিটার পোমেরান্তসেভ

ফাউন্টেন
পা ব লি কে শ ন্স

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা **৭**
মুখবন্ধ **৯**

পর্ব ১

ট্রলদের শহর **১৭**
ভুল তথ্যের কারসাজি ১৭
ট্রল ধরার ফাঁদ ৩৪

পর্ব ২

ডেমোক্রেসি অ্যাট সি **৫১**
গণতন্ত্রায়নের ঢেউ ৫২
স্থায়ী বিপ্লব ৬৩

পর্ব ৩

ইতিহাসের সবচেয়ে বিস্ময়কর তথ্যযুদ্ধের বজ্রপাত **৭৭**
অপারেশন পেরেস্ত্রোইকা ৭৮
ইতিহাসের সবচেয়ে বিস্ময়কর তথ্যযুদ্ধের বজ্রপাত ৮৩

পর্ব ৪

সফট ফ্যাক্টস **৯৯**
নিরপেক্ষতা হলো আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া একটা মিথ্যে ধারণা ১০০

কেন আমরা 'সত্য-পরবর্তী' যুগে বাস করছি........ ১০৮
আলেপ্পোর রাস্তায়........ ১১২

পর্ব ৫

পপ-আপ পিপল ১২৬
অন্যকে পর করে দেওয়া (Othering) ১২৬
পপ-আপ পপুলিজম ১৩৮
রাশিয়াতেই প্রথম ভবিষ্যতের দেখা মিলেছিল ১৪৪

পর্ব ৬

ভবিষ্যৎ শুরু এখান থেকেই........ ১৫৩
দেয়াল টপকে........ ১৬৪
পাঠকের পাতা ১৭৩

প্রকাশকের কথা

আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যেখানে তথ্যের প্রাচুর্য আছে, কিন্তু সত্যের অভাব। চারপাশে শব্দের বিস্ফোরণ, মতের বন্যা, খবরের অবিরাম স্রোত—তবুও সততা ও বিশুদ্ধতার মাটি যেন ক্রমেই আমাদের পায়ের নিচ থেকে সরে যাচ্ছে। আমরা অনেক কিছুই জানি, কিন্তু বুঝি খুব কম; দেখি অনেক কিছু, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি না। কখনো এমন কিছুকেই সত্য বলে মেনে নিই, যা আদৌ সত্য নয়; আবার কখনো নিরেট সত্যকেই মিথ্যা ভেবে পরিত্যাগ করি।

এই অস্থির ও বিভ্রান্ত সময়ের এক গভীর ও তীক্ষ্ণ প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে ‘প্রোপাগান্ডা ওয়ার: মস্তিষ্ক দখলের লড়াই’।

এটি কোনো গড়পরতা বই নয়; বরং আমাদের সময়ের এক নির্মম বাস্তবতার দলিল। এটি এমন এক যুদ্ধক্ষেত্রের চিত্র তুলে ধরে, যেখানে যুদ্ধের কোনো প্রচলিত রূপ নেই—নেই ট্যাংক, নেই মিসাইল, নেই দৃশ্যমান সীমান্তরেখা। তবুও এখানে এক ভয়ংকর সংঘাত চলমান, যা মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এই যুদ্ধের ময়দান মানুষের মস্তিষ্ক, আর এর প্রধান অস্ত্র—তথ্য, বিভ্রান্তি এবং প্রভাব বিস্তারের সূক্ষ্ম কলাকৌশল।

এই গ্রন্থ আমাদের দেখায়, কীভাবে আধুনিক প্রযুক্তি—বিশেষত সোশ্যাল মিডিয়া—মানুষের চিন্তা ও আচরণকে প্রভাবিত করার এক অভূতপূর্ব শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ট্রল, বট, ডার্ক অ্যাড, ডিপফেক কিংবা সাজানো তথ্য—এসব আর বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়; বরং একটি সুসংগঠিত প্রক্রিয়ার অংশ, যার লক্ষ্য মানুষের উপলব্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করা।

এই বইয়ের সবচেয়ে বড় সাফল্য এখানেই যে, এটি কেবল তথ্য সরবরাহ করে না—এটি আমাদের অস্বস্তিতে ফেলে, প্রশ্ন করতে শেখায়। আমরা যা বিশ্বাস করি, তা কি

সত্যিই আমাদের নিজের বিশ্বাস? নাকি কোনো অদৃশ্য প্রভাব তা নির্মাণ করছে? আমরা কি সত্য অনুসন্ধান করছি, নাকি কেবল আমাদের পছন্দসই 'সত্য'কেই আঁকড়ে ধরে আছি?

একজন প্রকাশক হিসেবে আমি মনে করি, একটি ভালো বই পাঠককে স্বস্তি দেয় না—বরং তাকে ভাবতে বাধ্য করে। এই বইটি সেই বিরল কাজটিই করেছে। এটি পাঠককে গভীর আত্মসমালোচনার মুখোমুখি দাঁড় করায় এবং আমাদের সময়ের জটিল বাস্তবতাকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার আহ্বান জানায়।

উল্লেখ্য, বইটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা আক্ষরিক অনুবাদের পথ এড়িয়ে ভাবানুবাদের ধারাকে অনুসরণ করেছি। প্রয়োজনে কিছু অপ্রাসঙ্গিক বা অতিরিক্ত অংশ সংক্ষেপ করা হয়েছে পাঠের স্বচ্ছতা ও গতি বজায় রাখার স্বার্থে। তবে সর্বোচ্চ যত্ন নেওয়া হয়েছে, যাতে গ্রন্থের মূলভাব ও অন্তর্নিহিত শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তা সাবলীল ও প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় উপস্থাপিত হয়। আমরা বিশ্বাস করি, এই বই বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক—কারণ এই তথ্যযুদ্ধের প্রভাব থেকে আমাদের সমাজও মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়।

সবশেষে, এই গ্রন্থ পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে আমরা একটি প্রত্যাশা লালন করি—যেন এটি কেবল জ্ঞান বাড়ায় না, বরং বোধ জাগিয়ে তোলে; যেন এটি আমাদের আরও সচেতন, আরও সতর্ক এবং আরও মানবিক করে তোলে। কারণ, এই অদৃশ্য যুদ্ধের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা—একটি জাগ্রত, প্রশ্নমুখর এবং স্বাধীন চিন্তা।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০৬-৪-২০২৬

মুখবন্ধ

টেলিগ্রাম!

সমুদ্র স্নান শেষ করে সে সবেমাত্র ডাঙায় উঠেছে। ঠিক তখনই তাকে গ্রেফতার করা হলো। ভেজা সাঁতারের পোশাক পরা লোকটার মাথার ওপর স্যুট-বুট পরা দুজন মানুষ এসে দাঁড়ায়। তাদের কড়া নির্দেশ, জলদি কাপড় পরুন। ভেজা পোশাকের ওপর দিয়েই ট্রাউজার্স গলিয়ে নিতে বাধ্য হলো সে। গাড়িতে ওঠার পর ভেজা কাপড়ের ছোঁয়ায় একটা অদ্ভুত অস্বস্তি হচ্ছিল। কাপড়টা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসছিল, শরীর হিম করে দিচ্ছিল, আর ট্রাউজার্সের ভেতর দিয়ে গাড়ির পেছনের সিটে একটা ভিজে দাগ বসে যাচ্ছিল। জেরা করার সময়ও তাকে এই ভেজা কাপড়েই বসিয়ে রাখা হলো। লোকটা প্রাণপণে চেষ্টা করছিল নিজের গাম্ভীর্য ধরে রাখতে। কিন্তু ওই স্যাঁতসেঁতে ভেজা কাপড়ের অস্বস্তি তাকে ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে দিচ্ছিল। হঠাৎ তার মাথায় একটা চিন্তা খেলল, এরা ইচ্ছে করেই এমনটা করেছে। মাঝারি সারির এই কেজিবি অফিসাররা এসব কাজে বেশ পটু। ছোটখাটো অপমান আর সূক্ষ্ম মানসিক খেলা, এসব তাদের একেবারে নখদর্পণে।

সে মনে মনে ভাবল, তাকে কিয়েভের বাড়ি থেকে না ধরে এই ওডেসায় কেন গ্রেফতার করা হলো? একটু পরেই ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আগস্ট মাস চলছে। অফিসাররা আসলে সমুদ্রের পাড়ে কয়েকদিন ছুটি কাটাতে চেয়েছে। জেরা করার ফাঁকে ফাঁকে তারা নিজেরাও সমুদ্রে গোসল করতে যাবে। একজন যখন তার পাহারায় বসে থাকবে, অন্যজন তখন পানিতে দাপাদাপি করবে। একবার তারা যখন সৈকতে গেল, একজন শিল্পী ইজেল বের করে তাদের তিনজনের ছবি আঁকতে বসল। কর্নেল আর মেজর সাহেব একটু ঘাবড়ে গেলেন। তারা কেজিবি অফিসার, কোনো অপারেশনের সময় তাদের ছবি তোলা বা আঁকা একদম নিষেধ। তারা বন্দিকে

হুকুম দিল, যাও, গিয়ে দেখো তো ব্যাটা কী আঁকছে। সে কাছে গিয়ে উঁকি দিল। এবার তার পালা ওদের সাথে একটু মজা করার। সে ফিরে এসে মুচকি হেসে বলল, আমার চেহারাটা সে ঠিকমতো মেলাতে পারেনি, কিন্তু আপনাদের দুজনের ছবি একেবারে জ্যান্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

তাকে আটকে রাখা হয়েছিল বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের মাঝে ক্ষতিকর বইপত্র বিলি করার অপরাধে। সোভিয়েত গুলাগ নিয়ে সত্যি কথা লেখার কারণে সোলঝেনিৎসিনের বই, আর দেশান্তরি জীবনে লেখার কারণে নবোকভের বই তখন পুরোপুরি নিষিদ্ধ।

এই ঘটনা জানা সম্ভব হয়েছিল ক্রনিকল অব কারেন্ট ইভেন্টস নামের একটা উদ্যোগের কারণে। সোভিয়েত ভিন্নমতাবলম্বীরা এভাবেই রাজনৈতিক গ্রেফতার, জেরা, তল্লাশি, বিচার, মারধর আর জেলের ভেতরের অত্যাচারের গোপন তথ্যগুলো লিখে রাখত। এসব তথ্য জোগাড় করা হতো মানুষের মুখে মুখে শুনে। লেবার ক্যাম্প বা শ্রমশিবিরগুলো থেকে খবর পাচার করার পদ্ধতিটা ছিল আরও রোমাঞ্চকর। ছোট ছোট পলিথিনের ক্যাপসুলে ভরে খবরগুলো গিলে ফেলা হতো, তারপর মলত্যাগের মাধ্যমে বের করে আনা হতো। অন্ধকার ঘরে বসে সেই কাগজগুলো টাইপ করে ছবি তোলা হতো। এরপর হাত ঘুরে, বইয়ের পাতায় বা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে করে সেগুলো পৌঁছাতো পশ্চিমা বিশ্বে। সেখান থেকে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের হাতে যেত, প্রচার হতো বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস, ভয়েস অব আমেরিকা বা রেডিও ফ্রি ইউরোপে। তাদের লেখার ধরন ছিল একদম ছিমছাম আর সোজাসাপ্টা।

ঠিক যেমন লেখা হয়েছিল, কেজিবি কর্নেল ভি. পি. মেনশিকভ এবং কেজিবি মেজর ভি. এন. মেলগুনভ তাকে জেরা করেছে। সে সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। নিজের বন্ধুবান্ধব আর পরিচিতদের ব্যাপারে কোনো তথ্য দিতে রাজি হয়নি। পুরো ছয়দিন তাদের রাখা হয়েছিল হোটেল নিউ মস্কোতে।

জেরা করার সময় একজন অফিসার যখন বাইরে যেত, অন্যজন তখন একটা পেন্সিল কামড়াতে কামড়াতে দাবার পাজল মেলাতে বসে যেত। প্রথম দিকে বন্দি লোকটা ভাবত, এটাও বোধহয় কোনো গভীর মানসিক চাল। পরে বুঝতে পারল, আসলে লোকটা প্রচণ্ড অলস, ডিউটির সময় কোনোমতে সময় কাটানোর চেষ্টা করছে।

ছয়দিন পর তাকে কিয়েভে ফেরার অনুমতি দেওয়া হলো, কিন্তু তদন্ত চলতেই থাকল।

লাইব্রেরির কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে কালো রঙের গাড়িটা এসে থামত, আর তাকে তুলে নিত নতুন কোনো জেরার জন্য।

এর মাঝেও জীবন তার নিজের নিয়মে চলছিল। তার বাগদত্তা সন্তানসম্ভবা হলেন। তারা বিয়ে করলেন। বিয়ের আসরের একেবারে পেছনের দিকে ঘাপটি মেরে বসে ছিল কেজিবির একজন ফটোগ্রাফার।

সে তার স্ত্রীর পরিবারের সাথে একটা ফ্ল্যাটে উঠে এল। ফ্ল্যাটের ঠিক উল্টোদিকেই গোলসিভস্কি পার্ক। তার শ্বশুরমশাই সেখানে কয়েক ডজন ক্যানারি পাখির জন্য খাঁচার একটা আস্ত রাজপ্রাসাদ বানিয়ে রেখেছেন। পার্কের পটভূমিতে রঙিন পালকের এক অদ্ভুত নাচন। যখনই ডোরবেল বেজে উঠত, সে চমকে উঠত। কেজিবি এসেছে ভেবে আতঙ্কে চিঠি, সামিজদাত আর্টিকেল বা গ্রেফতারের তালিকা, যা কিছু বিপদে ফেলতে পারে, সব পুড়িয়ে ফেলতে শুরু করত। ভয়ে ক্যানারি পাখিগুলো খাঁচার ভেতর ডানা ঝাপটাতে থাকত। প্রতিদিন ভোরে সে ঘুম থেকে উঠত। খুব সাবধানে স্পিডোলা রেডিওটা অন করে শর্টওয়েভ ধরত। জ্যামিংয়ের কুয়াশা কাটাতে অ্যান্টেনাটা নেড়েচেড়ে ঠিক করত। সবচেয়ে ভালো সিগন্যাল পাওয়ার জন্য চেয়ার আর টেবিলের ওপর উঠে দাঁড়াত। পূর্ব জার্মানির পপ গান আর সোভিয়েত মিলিটারির ব্যান্ডের আওয়াজের মাঝখান দিয়ে খুব সন্তর্পণে নব ঘুরিয়ে সে একটা জাদুকরী শব্দের অপেক্ষায় কান পেতে থাকত। রেডিওর হিসহিস আর খসখস আওয়াজ ভেদ করে ভেসে আসত, দিস ইজ লন্ডন, দিস ইজ ওয়াশিংটন। সে আসলে গ্রেফতারের খবরগুলো শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। ১৯২১ সালে লেখা ফিউচারিস্ট কবি ভেলিমির খলেবনিকভের রেডিও অব দ্য ফিউচার প্রবন্ধটা সে পড়েছিল। সেখানে লেখা ছিল, 'রেডিও বিশ্বজনীন আত্মার এক অবিচ্ছিন্ন শিকল তৈরি করবে এবং মানবজাতিকে এক সুতোয় গেঁথে ফেলবে।' তার পরিচিত গণ্ডির চারপাশে জালের ফাঁস ছোট হয়ে আসছিল। গ্রিশাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক পেটানো হলো। ওলগার বিরুদ্ধে পতিতাবৃত্তির অভিযোগ আনা হলো, আর সেটা প্রমাণ করার জন্য তাকে সত্যি সত্যি পতিতাদের সাথে একটা যৌনরোগের ক্লিনিকে আটকে রাখা হলো। গেলিকে রিমান্ডে নেওয়ার পর এমনভাবে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হলো যে, লোকটা একসময় মারাই গেল।

সবাই সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তার শাশুড়ি তাকে সসেজ দিয়ে তৈরি একটা গোপন সাংকেতিক ভাষা শিখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

আমি যদি ডান থেকে বামে কাটা সসেজ নিয়ে আসি, তার মানে আমরা তোমার গ্রেফতারের খবর পশ্চিমা বিশ্বে পৌঁছাতে পেরেছি এবং সেটা রেডিওতে প্রচার হয়েছে। আর যদি বাম থেকে ডানে কাটি, বুঝবে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।

পরে সে লিখেছিল, পুরো ব্যাপারটা শুনতে কোনো পুরোনো জোকস বা সস্তা সিনেমার গল্পের মতো মনে হতে পারে, কিন্তু এটাই ছিল নিরেট বাস্তব। কেজিবি যখন ভোরবেলা দরজায় কড়া নাড়ে, আর আপনি আধো ঘুমে বিড়বিড় করে জানতে চান, কে ওখানে? তারা সাধারণত চিৎকার করে বলে, টেলিগ্রাম! আপনি তখনও অর্ধেক ঘুমের ঘোরে। ঘুমটা যেন পুরোপুরি ভেঙে না যায়, সেদিকে খেয়াল রেখে আবার সেই আরামদায়ক স্বপ্নে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। আপনি বিরক্ত হয়ে বলেন, আসছি। হাতের কাছে থাকা ট্রাউজার্সটা কোনোমতে গলিয়ে, মেসেঞ্জারকে বকশিশ দেওয়ার জন্য কয়েকটা খুচরো পয়সা খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দরজাটা খোলেন।

আর সবচেয়ে কষ্টের বিষয় এটা নয় যে ওরা তোমাকে ধরতে এসেছে, বা এত সকালে তোমার ঘুম ভাঙিয়েছে। সবচেয়ে কষ্টের হলো, তুমি একটা ছোট বাচ্চার মতো 'টেলিগ্রাম এসেছে' এই ডাহা মিথ্যে কথাটা বিশ্বাস করেছ। অপমানে তোমার চোখে জল চলে আসতে চায়, আর তুমি সেটা আটকাতে গিয়ে ঘামে ভেজা খুচরো পয়সাগুলো তোমার গরম হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরো।

১৯৭৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর, সকাল ৮টা। জেরার ফাঁকে ফাঁকেই তাদের সন্তানের জন্ম হলো। আমার দাদি চেয়েছিলেন তাঁর দাদার নামানুসারে আমার নাম রাখা হোক পিনহাস। বাবা-মা চেয়েছিলেন থিওডোর। শেষমেশ আমার নাম রাখা হলো পিওতর। নামের এই যে দরাদরি, এটা তো সবে শুরু।

চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে। আমার বাবা-মা শুধু নিজেদের ইচ্ছেমতো বই পড়া, লেখা, শোনা আর স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার চেয়েছিলেন। আর এই সামান্য কারণেই কেজিবি তাদের তাড়া করে ফিরেছিল। আজ মনে হয়, তারা যে পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে বার্লিন দেয়ালের মতো সেন্সরশিপও ভেঙে পড়বে, সেই পৃথিবীটা বোধহয় আমাদের অনেক কাছে চলে এসেছে। আমরা এখন এমন এক যুগে বাস করছি, যাকে পণ্ডিতরা বলেন 'তথ্যের প্রাচুর্য'। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে অধিকার আর স্বাধীনতার যে সংগ্রামের ওপর ভিত্তি করে এই ধারণা গড়ে উঠেছিল—যেখানে একদিকে ছিল সত্য আর তথ্য সম্বলিত সাধারণ মানুষ, আর অন্যদিকে সেন্সরশিপ আর গোপন পুলিশে ঘেরা শাসকগোষ্ঠী—সেই পুরো হিসাবটাই এখন উল্টে গেছে।

আমাদের হাতে এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি তথ্য আছে, কিন্তু সেই তথ্য শুধু যে আমাদের প্রত্যাশিত সুবিধাগুলোই এনে দিয়েছে, তা কিন্তু নয়।

কথা ছিল, তথ্য যত বাড়বে, ক্ষমতাশালীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর স্বাধীনতাও তত বাড়বে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, এই তথ্যই ক্ষমতাশালীদের হাতে ভিন্নমতের কণ্ঠরোধ করার নতুন নতুন হাতিয়ার তুলে দিয়েছে। কথা ছিল, তথ্য বাড়লে আরও বেশি যুক্তিপূর্ণ বিতর্ক হবে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমরা আগের চেয়েও অনেক কম আলোচনা বা যুক্তিতর্কে অংশ নিতে পারি। কথা ছিল, তথ্য বাড়লে দেশের সীমানা পেরিয়ে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়বে, কিন্তু এই তথ্যই আবার নতুন আর অনেক বেশি সূক্ষ্ম ধরনের সংঘাত ও অন্তর্ঘাতের জন্ম দিয়েছে। আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি, যেখানে গণহারে মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা একেবারে লাগামছাড়া হয়ে গেছে। ম্যানিপুলেশন বা কারসাজির উপায়গুলো দিন দিন বাড়ছে আর ছড়াচ্ছে। ডার্ক অ্যাড, সাই-অপস, হ্যাকিং, বট, সফট ফ্যাক্টস, ডিপ ফেক, ভুয়া খবর, আইএসআইএস, পুতিন, ট্রল, ট্রাম্প—এসবই এখন আমাদের পৃথিবীর নিত্যদিনের সঙ্গী।

বাবার গ্রেফতার আর জেরার চল্লিশ বছর পর, আমি নিজেকে বাবা-মায়ের সেই পথেরই এক অস্পষ্ট ছাপ ধরে হাঁটতে দেখি। তবে তাদের মতো সাহস, ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বা দৃঢ়তা আমার নেই।

যাইহোক, আমি লন্ডনের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউটে একটা প্রোগ্রাম চালাই। সেখানে আমরা প্রভাব বিস্তারের নতুন নতুন কৌশল নিয়ে গবেষণা করি। এই জিনিসগুলোকে সাধারণ ভাষায় 'প্রোপাগান্ডা' বলা যেতে পারে। তবে এই শব্দটার অর্থ নিয়ে এত মতভেদ আছে—কেউ বলেন এটা স্রেফ ধোঁকাবাজি, আবার কেউ বলেন এটা শুধু মতবাদ প্রচারের একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া—যে আমি এই শব্দটা ব্যবহার করা এড়িয়েই চলি।

বলা ভালো, আমি কোনো অ্যাকাডেমিক মানুষ নই, আর এই বইটাও কোনো অ্যাকাডেমিক গবেষণা নয়। আমি একসময়ের টেলিভিশন প্রযোজক। যদিও এখনও মাঝে মাঝে আর্টিকেল লিখি বা রেডিওতে প্রোগ্রাম করি, কিন্তু এখন আমার পুরোনো মিডিয়া জগতের দিকে তাকালে আমার নিজেরই কেমন সন্দেহ হয়। মাঝে মাঝে আমরা যা বানিয়েছি, তা দেখে আমি শিউরে উঠি। আমার গবেষণার কাজে আমাকে নানা ধরনের মানুষের মুখোমুখি হতে হয়। টুইটারের বিপ্লবী, হঠাৎ গজিয়ে ওঠা

পপুলিস্ট, ইন্টারনেট ট্রল আর এলফ, 'আচরণের পরিবর্তন' নিয়ে যারা কাজ করে, তথ্যযুদ্ধের ভণ্ড, জিহাদি ফ্যানবয়, আইডেন্টিটারিয়ান বা যারা শুধু নিজেদের পরিচয় নিয়েই মগ্ন থাকে, মেটা-পলিটিশিয়ান, তথ্যের সত্যতা যাচাইকারী পুলিশ, আর যারা ইন্টারনেটে বট নিয়ন্ত্রণ করে—এদের সবার সাথেই আমার দেখা হয়। তারপর এই সব অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি আমার অফিসে ফিরে আসি। একটা ষড়ভুজাকার, কংক্রিটের টাওয়ারে আমার অস্থায়ী অফিস। সেখানে বসে আমি এসব কিছু গুছিয়ে সুন্দর ফরম্যাটের রিপোর্ট আর পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন বানাই। তাতে থাকে যুক্তিসঙ্গত উপসংহার আর সুপারিশ। কীভাবে এই যে ভুল তথ্য, 'ফেক নিউজ', 'ইনফরমেশন ওয়ার' বা 'ওয়ার অন ইনফরমেশন'-এর বন্যা বয়ে যাচ্ছে, তার হাত থেকে বাঁচার উপায় খুঁজে বের করা যায়, সেটাই থাকে আমার রিপোর্টে।

কিন্তু আসলে কিসের প্রতিকার? আমার রিপোর্টের সুন্দর করে সাজানো বুলেট পয়েন্টগুলো দেখে মনে হয় যেন সত্যি সত্যিই এমন কোনো গোছানো সিস্টেম আছে, যা ঠিক করা সম্ভব। মনে হয়, নতুন তথ্য প্রযুক্তির ওপর কয়েকটা কারিগরি সুপারিশ প্রয়োগ করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অথচ সমস্যাটা আরও অনেক গভীরে। আমার দৈনন্দিন কাজের অংশ হিসেবে, আমি যখন আমার গবেষণার ফলগুলো সেই ক্ষয়িষ্ণু লিবারেল ডেমোক্রেটিক অর্ডারের প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরি—যে অর্ডারের অনেকটাই স্নায়ুযুদ্ধের সংঘাত থেকে জন্ম নিয়েছিল—তখন আমি অবাক হয়ে দেখি, তারা কতটা দিশেহারা। রাজনীতিবিদরা এখন আর জানেন না তাদের দল আসলে কিসের প্রতিনিধিত্ব করে। আমলারা জানেন না ক্ষমতা আসলে কোথায় লুকিয়ে আছে। কোটিপতিদের ফাউন্ডেশনগুলো এমন এক 'ওপেন সোসাইটি' বা মুক্ত সমাজের কথা বলে, যার কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞাই তারা এখন আর দিতে পারে না। 'গণতন্ত্র', 'স্বাধীনতা', 'ইউরোপ', 'পশ্চিম'—এই বড় বড় শব্দগুলো একসময় অনেক অর্থবহ ছিল, আগের প্রজন্মের মানুষ এসবের জন্য হাসিমুখে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু জীবন এই শব্দগুলোকে এমনভাবে পেছনে ফেলে এসেছে যে, এখন এগুলোকে আমার হাতের মুঠোয় থাকা খালি খোলসের মতো মনে হয়। মনে হয় যেন এদের সব উষ্ণতা আর আলো ফুরিয়ে গেছে। অথবা, এগুলো যেন এমন কিছু কম্পিউটার ফাইল, যার পাসওয়ার্ড আমরা ভুলে গেছি আর কিছুতেই খুলতে পারছি না।

নিজেদের পরিচয় দিতে আমরা যে শব্দগুলো ব্যবহার করি—যেমন 'বাম' আর 'ডান', 'উদারপন্থী' আর 'রক্ষণশীল'—এগুলোরও এখন আর তেমন কোনো অর্থ

নেই। আর এর প্রভাব শুধু সংঘাত বা নির্বাচনের মধ্যেই আটকে নেই। আমি দেখি, সারাজীবন যাদের চিনেছি, তারাও সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এমন সব সূত্র থেকে তারা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব শেয়ার করছে, যার নাম আমি জীবনেও শুনিনি। ইন্টারনেটের এই চোরাস্রোত পুরো পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। মনে হয় যেন আমরা একে অপরকে কখনোই চিনতাম না। মনে হয় যেন অ্যালগরিদম আমাদের সম্পর্কে আমাদের চেয়েও বেশি জানে। মনে হয় যেন আমরা আমাদেরই ডেটার একটা ক্ষুদ্র অংশে পরিণত হচ্ছি। আর সেই ডেটা তার নিজের নিয়মে আমাদের সম্পর্ক আর পরিচয় নতুন করে সাজাচ্ছে। অথবা, হয়তো আমরা যাকে দেখতে পাচ্ছি না, এমন কারো স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই এসব হচ্ছে। পুরোনো মিডিয়ার বিশাল বিশাল মাধ্যমগুলো—রেডিও আর টেলিভিশনের ক্যাথোড-রে টিউব, বইয়ের বাঁধাই আর খবরের কাগজের ছাপাখানা—এগুলোই একসময় আমাদের পরিচয় আর অর্থকে ধরে রাখত, নিয়ন্ত্রণ করত। আমরা কে, আমরা কীভাবে একে অপরের সাথে কথা বলি, কীভাবে আমরা আমাদের সন্তানদের কাছে পৃথিবীকে তুলে ধরি, কীভাবে আমরা আমাদের অতীতের সাথে কথা বলি, কীভাবে আমরা খবর আর মতামতের, ব্যঙ্গ আর গাম্ভীর্যের, ঠিক আর ভুলের, সত্য আর মিথ্যার, বাস্তব আর অবাস্তবের সংজ্ঞা দিই—এই সবকিছুই এখন সেই ফাটল ধরা আর ভেঙে পড়া মাধ্যমগুলোর সাথে সাথে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কে কার সাথে কীভাবে যুক্ত, কে কার সাথে কীভাবে কথা বলে—এই পুরোনো হিসাবগুলো সব এলোমেলো হয়ে গেছে। সবকিছু এখন বড়, ছোট, বিকৃত হয়ে এক দিশেহারা ঘূর্ণিতে পাক খাচ্ছে, যেখানে শব্দের কোনো সাধারণ অর্থ আর অবশিষ্ট নেই। ওডেসা, ম্যানিলা, মেক্সিকো সিটি, নিউজার্সি—সব জায়গাতেই আমি একই কথা শুনতে পাই: 'এত বেশি তথ্য, এত বেশি ভুল তথ্য, এত বেশি সবকিছু যে, কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে, তা আমি আর বুঝতেই পারছি না।' প্রায়ই আমি মানুষকে বলতে শুনি, 'আমার মনে হচ্ছে আমার পায়ের নিচের মাটি সরে যাচ্ছে।' আমি নিজেও মাঝে মাঝে ভাবি, 'আমার মনে হয় যা কিছু আমি শক্ত আর স্থির বলে জানতাম, তা এখন টলমলে, তরল হয়ে গেছে।'

এই বইটা সেই ধ্বংসস্তূপেরই খোঁজখবর নেয়। বোঝার চেষ্টা করে, এই ধ্বংসাবশেষ থেকে একটুখানি অর্থ বা সাধারণ জ্ঞান আদৌ উদ্ধার করা যায় কি না। ইন্টারনেটের সেই স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার কোণ থেকে, যেখানে ট্রলরা তাদের শিকারকে নির্যাতন করে, সেখান থেকে শুরু করে আমাদের সমাজের গল্পগুলো নিয়ে যে টানাটানি

চলছে, তার ভেতর দিয়ে গিয়ে, শেষমেশ আমরা নিজেদের কীভাবে তুলে ধরি, সেটাই বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইয়ে।

প্রথম পর্বে আমরা ফিলিপাইন থেকে গালফ অফ ফিনল্যান্ড পর্যন্ত যাব। সেখানে আমরা দেখব, কেজিবি একসময় মানুষের ওপর ছড়ি ঘোরানোর জন্য যে পুরোনো কায়দাগুলো ব্যবহার করত, তার চেয়েও সূক্ষ্ম আর নতুন তথ্যপ্রযুক্তির হাতিয়ার দিয়ে কীভাবে মানুষকে মানসিক বা সামাজিকভাবে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়।

দ্বিতীয় পর্বে আমরা পশ্চিম বলকান থেকে শুরু করে লাতিন আমেরিকা আর ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যাব। সেখানে আমরা জানব, কীভাবে পুরো একটা প্রতিরোধ আন্দোলন আর তাদের গড়ে তোলা বিশ্বাস বা মিথগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া যায়।

তৃতীয় পর্বে আমরা দেখব, একটা দেশ কীভাবে আরেকটা দেশকে প্রায় ছুঁয়ে না দেখেই ধ্বংস করে দিতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় যুদ্ধ আর শান্তির মধ্যে, কিংবা 'ভিতরের' আর 'বাইরের' মধ্যে যে পার্থক্য থাকে, তা একেবারে ঝাপসা হয়ে যায়। আর এর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিকটা হলো 'তথ্যযুদ্ধ' বা 'ইনফরমেশন ওয়ার' নামের এই ধারণাটা নিজেই।

চতুর্থ পর্বে আমরা আলোচনা করব, কীভাবে তথ্যভিত্তিক রাজনীতির চাহিদা আসলে প্রগতি আর ভবিষ্যতের একটা নির্দিষ্ট ধারণার ওপর নির্ভরশীল। আর যখন সেই ভবিষ্যতের ধারণাটা ভেঙে পড়ে, তখন কীভাবে গণহারে মানুষ মারা আর অত্যাচার করার রাস্তা আরও বেশি প্রশস্ত হয়ে যায়।

পঞ্চম পর্বে আমি যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করব যে, এই যে একটা অস্থির অবস্থা চলছে, এর মধ্যে রাজনীতি আসলে মানুষের পরিচয় নিয়ন্ত্রণের একটা লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। ধর্মীয় চরমপন্থী থেকে শুরু করে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা পপুলিস্ট নেতা—সবাই 'জনগণ' শব্দটার নতুন নতুন ভার্সন বা রূপ তৈরি করতে চায়। এমনকি ব্রিটেনের মতো দেশেও, যেখানে মানুষের পরিচয় সবসময় একটা নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা ছিল বলে মনে হতো, সেখানেও একই অবস্থা।

ষষ্ঠ পর্বে আমি ভবিষ্যতের খোঁজ করব—চীনে।

পর্ব ১

ট্রলদের শহর

বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে পরিষ্কার সংঘাতগুলোর একটা ছিল বাকস্বাধীনতা বনাম সেন্সরশিপ। স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মনে হয়েছিল, অনেক জায়গাতেই বাকস্বাধীনতা জিতেছে। কিন্তু কী হবে যদি ক্ষমতাশালীরা এই 'তথ্যের প্রাচুর্য' ব্যবহার করে আপনাকে চুপ করিয়ে দেওয়ার নতুন নতুন উপায় খুঁজে বের করে? যদি তারা বাকস্বাধীনতার আদর্শকেই উল্টে দিয়ে ভিন্নমতকে গুঁড়িয়ে দেয়, আর সেই সাথে এমন একটা নাম-পরিচয়হীন অবস্থা বজায় রাখে, যাতে তারা সবসময় দায় এড়িয়ে যেতে পারে?

ভুল তথ্যের কারসাজি

ফিলিপাইনের কথাই ধরুন না। ১৯৭৭ সালে, যখন আমার বাবা-মা কেজিবির 'আতিথেয়তা' উপভোগ করছিলেন, তখন ফিলিপাইন শাসন করতেন কর্নেল ফার্দিনান্দ মার্কোস। আমেরিকার মদদপুষ্ট এই সামরিক স্বৈরশাসকের আমলে কী হয়েছিল, তা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ওয়েবসাইটে একটু খুঁজলেই জানা যায়—৩,২৫৭ জন রাজনৈতিক বন্দিকে হত্যা করা হয়েছিল, ৩৫,০০০ জনের ওপর অত্যাচার চালানো হয়েছিল, আর ৭০,০০০ জনকে জেলে ভরা হয়েছিল। মার্কোসের একটা অদ্ভুত আর নাটকীয় দর্শন ছিল—সমাজকে শান্ত রাখতে হলে মানুষকে অত্যাচার করাটা খুব জরুরি। তাই যাদের গুম করা হতো, তাদের মধ্যে ৭৭ শতাংশেরই লাশ রাস্তার ধারে ফেলে রাখা হতো, যাতে অন্যরা দেখে ভয় পায়। ধরুন, শিকারের মগজ বের করে নিয়ে তার ফাঁকা মাথার খুলিতে তার নিজেরই অন্তর্বাস

গুঁজে দেওয়া হতো। অথবা শরীর টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হতো, যাতে মানুষ বাজারে যাওয়ার পথে শরীরের সেসব টুকরো দেখে আঁতকে ওঠে।

১৯৮৬ সালে ব্যাপক গণবিক্ষোভের মুখে মার্কোসের পতন ঘটে। আমেরিকা সমর্থন তুলে নেয় আর সেনাবাহিনীর একটা অংশও তার সঙ্গ ছাড়ে। লাখ লাখ মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। সবাই ভেবেছিল, এবার একটা নতুন দিনের শুরু হবে—দুর্নীতির শেষ হবে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অবসান ঘটবে। মার্কোসকে নির্বাসনে পাঠানো হয়, আর জীবনের শেষ দিনগুলো সে হাওয়াইতে কাটায়।

আজকের ম্যানিলা আপনাকে স্বাগত জানাবে পচা মাছ আর পপকর্নের ভুরভুরে গন্ধ দিয়ে। বাতাসে ভেসে আসা নর্দমা আর পোড়া তেলের গন্ধ ফুটপাতে দাঁড়িয়েই আপনার গা গুলিয়ে তুলবে। সত্যি বলতে 'ফুটপাত' শব্দটা এখানে বেমানান। অন্তত প্রশস্ত হাঁটার রাস্তা বলতে যা বোঝায়, তা এখানে নেই বললেই চলে। তার বদলে শপিং মল আর গগনচুম্বী দালানগুলোর গা ঘেঁষে সরু কার্নিশ চলে গেছে, যেখানে পাশ দিয়ে বয়ে চলা গাড়ির স্রোতের মাঝে আপনাকেও একটু একটু করে এগোতে হবে। বড় বড় মলগুলোর মাঝে শহরের বুক চিরে রয়েছে বস্তির গভীর খাদ। রাতের বেলা এই বস্তিগুলোর গলিতে গৃহহীন মানুষগুলো রুপোলি ফয়েলে নিজেদের মুড়িয়ে ঘুমায়, আর তাদের পাগুলো বাইরে বেরিয়ে থাকে। এই গলিগুলোর পাশেই রয়েছে বামনদের বক্সিং আর কারাওকে পার্লার। সেখানে এমন সব মেয়েদের দল ভাড়া পাওয়া যায়, যাদের পরনের আঁটসাঁট পোশাক যেন শরীরের সাথে একেবারে লেপ্টে থাকে। তাদের সাথে নিয়ে আপনি চাইলে কোরিয়ান পপ গানও গাইতে পারবেন।

দিনের বেলা মার্কেট, বস্তি আর গগনচুম্বী দালানগুলোর মাঝের শূন্যস্থান পেরোতে আপনাকে মাঝ আকাশে ঝুলে থাকা ভিড়ে ঠাসা সরু হাঁটার রাস্তা ধরে এগোতে হবে, যেগুলো বহুতল মোটরওয়ের ফাঁক গলে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় আপনাকে মাথা নিচু করতে হবে। নিচের রাস্তা থেকে ভেসে আসা হর্ন আর সাইরেনের কানফাটানো শব্দে আপনি হয়তো একটু চমকে উঠবেন। আর হঠাৎ করেই দেখবেন, চোখের সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে কোনো ট্রেন। কিংবা বিশাল কোনো বিলবোর্ডে স্প্যাম মাংস খাচ্ছে, এমন কোনো মেয়ের ছবির সাথে আপনার চোখাচোখি হয়ে যাবে। এই বিলবোর্ডগুলো শহরের সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে, যেন বস্তি আর আকাশচুম্বী দালানগুলোকে আলাদা করে রেখেছে। ১৮৯৮ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত (মাঝখানে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জাপানি দখলদারিত্ব

ছাড়া) ফিলিপাইন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে ছিল। তখন থেকেই এখানে মার্কিন নৌঘাঁটি রয়েছে, আর মার্কিন সেনাবাহিনীর খাবার এখানকার মানুষের কাছে একটা সুস্বাদু খাবারে পরিণত হয়েছে। একটা পোস্টারে দেখা যাচ্ছে, একজন হাসিখুশি গৃহিণী তার সুদর্শন স্বামীকে টিন থেকে বের করা টুনামাছ খাওয়াচ্ছে। আরেক জায়গায়, একটা বিলবোর্ডে চর্বি চুইয়ে পড়া রোস্ট করা হ্যামের ছবি, আর তার নিচেই ধোঁয়া ওঠা একটা নদী, যেখানে পথশিশুরা সাঁতার কাটছে। তার পেছনেই জ্বলজ্বল করছে একটা ইলেকট্রিক সাইন—'যিশু আপনাকে রক্ষা করবেন'। এটা একটা ক্যাথলিক দেশ—আমেরিকার পঞ্চাশ বছরের শাসনের আগে এরা তিনশো বছর স্প্যানিশদের অধীনে ছিল (ফিলিপিনোরা মজা করে বলে, 'আমাদের তিনশো বছরের গির্জা আর পঞ্চাশ বছরের হলিউড আছে')। মলগুলোর ভেতরেও গির্জা আছে যেখানে আপনি প্রার্থনা করতে পারবেন, আর গরিবদের দূরে রাখার জন্য পাহারাদারও আছে। দুই কোটি বিশ লাখ মানুষের এই শহরে সবার জন্য উন্মুক্ত কোনো জায়গার ধারণাই নেই। মলের ভেতরে গেলে কড়া এয়ার ফ্রেশনারের গন্ধে আপনার দমবন্ধ হয়ে আসবে। সস্তা মলগুলোতে, যেখানে ফাস্টফুডের ছড়াছড়ি, সেখানে ল্যাভেন্ডারের গন্ধ; আর একটু দামি মলগুলোতে হালকা লেবুর সুবাস। এই গন্ধগুলো শৌচাগারের গন্ধের মতোই মনে হয়। তাই আপনি বাইরে নর্দমার পাশেই থাকুন বা মলের ভেতরে—এই বাথরুমের মতো গন্ধ আপনাকে কিছুতেই ছাড়বে না।

একটু খেয়াল করলেই আপনার চোখে পড়বে সেলফির হিড়িক। সবাই সেলফি তুলছে। পাবলিক বাসের লোহার ক্যানিস্টারে চড়ে বসে থাকা ঘামে ভেজা, তেলচিটে ফ্লিপ-ফ্লপ পরা লোকটা থেকে শুরু করে মলে বসে ককটেলের জন্য অপেক্ষায় থাকা চিনা মেয়েরা—সবাই। ফিলিপাইনে সেলফি তোলার হার পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি। মাথাপিছু সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের দিক থেকেও এরা সবার ওপরে, আবার টেক্সট মেসেজ পাঠানোতেও। কেউ কেউ বলেন, সরকারের অযোগ্যতার কারণে বেঁচে থাকার তাগিদেই তারা পরিবার আর ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর এত বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তবে এই সেলফি তোলাটা যে সবসময় নিজের রূপের দেমাক দেখানোর জন্য, তা কিন্তু নয়। আসলে আপনি এমন মানুষকেই বিশ্বাস করবেন, যার চেহারা আপনি দেখতে পান। আর এই সোশ্যাল মিডিয়ার উত্থানের হাত ধরেই ফিলিপাইন ডিজিটাল যুগের এক নতুন ধরনের কারসাজির রাজধানীতে পরিণত হয়েছে।

নীল কাঁচের জানালাওয়ালা আকাশচুম্বী দালানগুলোর পাশেই মলের এক নিরিবিলি জায়গায় 'পি'-এর সাথে আমার দেখা হলো। সে বারবার বলছিল তার আসল

নাম যেন আমি ব্যবহার না করি। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছিল সে ভেতরে ভেতরে কতটা উসখুস করছে। যেসব ক্যাম্পেইনের জন্য সে প্রকাশ্যে কোনো কৃতিত্ব নিতে পারে না, সেগুলোর একটা স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য সে মরিয়া হয়ে আছে। তার বয়স বিশের কোঠার প্রথম দিকে। তার পোশাক-আশাক দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনো কোরিয়ান বয় ব্যান্ডের সদস্য। সে যখন কোনো প্রেসিডেন্টকে জেতানোর কথা বলে, কিংবা তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ব্লু টিক (যেটা তার স্ট্যাটাস বোঝায়) পাওয়ার কথা বলে, তার গলার স্বরের উত্তেজনা একই রকম থাকে।

সে চিৎকার করে বলে ওঠে, ‘মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে আমার একটা অদ্ভুত আনন্দ হয়। হয়তো ব্যাপারটা খারাপ। কিন্তু এতে আমার অহংকার তৃপ্ত হয়, আমার ভেতরের কোনো একটা সুপ্ত বাসনা পূরণ হয়... আমার মনে হয় যেন ডিজিটাল দুনিয়ায় আমি একজন ঈশ্বর হয়ে গেছি।’ তবে তার কথাগুলো শুনে কোনো ভয়ংকর অপরাধীর কথা মনে হয় না, বরং মনে হয় যেন কোনো মিউজিক্যাল কমেডির খলনায়কের ডায়লগ শুনছি।

পনেরো বছর বয়সেই সে অনলাইনে নিজের ক্যারিয়ার শুরু করে। সে এমন একটা বেনামী পেজ খুলেছিল, যেখানে মানুষ তাদের ভালোবাসার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারত। সে জিজ্ঞেস করত, ‘তোমার সবচেয়ে বাজে ব্রেকআপের গল্পটা বলো তো।’ অথবা, ‘তোমার সবচেয়ে রোমান্টিক ডেটের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?’ সে আমাকে তার একটা ফেসবুক গ্রুপ দেখাল, যেখানে তিরিশ লাখেরও বেশি সদস্য আছে।

স্কুলে পড়ার সময়ই সে একের পর এক নতুন গ্রুপ খুলতে শুরু করল, আর প্রত্যেকটা গ্রুপের থিম ছিল আলাদা। যেমন ধরুন, একটা গ্রুপ ছিল শুধু আনন্দ-ফুর্তি নিয়ে, তো আরেকটা মানসিক শক্তি বাড়ানো নিয়ে। ষোলো বছর বয়সেই বড় বড় কোম্পানিগুলো তার সাথে যোগাযোগ করতে শুরু করল। তারা চাইত তাদের প্রোডাক্টের কথা যেন সে তার গ্রুপগুলোতে একটু-আধটু প্রচার করে দেয়। সেও নিজের এই কৌশলটা আরও নিখুঁত করে তুলল। সে একটা পুরো সপ্তাহ ধরে তার কমিউনিটির সাথে ‘ভালোবাসা’ নিয়ে কথা বলত, জানতে চাইত তারা কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। এরপর সে ধীরে ধীরে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিত প্রিয়জনকে নিয়ে তাদের ভয়ের দিকে, প্রিয়জনকে হারানোর আতঙ্কের দিকে। আর ঠিক তখনই সে খুব চালাকি করে একটা প্রোডাক্টের কথা ঢুকিয়ে দিত—এই ওষুধটা খেলে আপনার প্রিয়জনের আয়ু বেড়ে যাবে।

সে দাবি করে, কুড়ি বছর বয়সের মধ্যেই সব প্ল্যাটফর্ম মিলিয়ে তার পনেরো মিলিয়ন ফলোয়ার হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের একটা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে হঠাৎ করেই ম্যানিলার একটা বড় স্কাইস্ক্র্যাপারে নিজের একটা বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনে ফেলল। বিজ্ঞাপনের দুনিয়া জয় করার পর তার পরের টার্গেট ছিল রাজনীতি। সে সময় পলিটিক্যাল পিআর বলতে শুধু সাংবাদিকদের হাত করে নিজেদের পছন্দমতো খবর ছাপানোকেই বোঝানো হতো। কিন্তু যদি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পুরো রাজনৈতিক আলোচনাটাকেই নিজের মতো করে সাজানো যায়, তাহলে কেমন হয়?

সে তার এই আইডিয়াটা কয়েকটা রাজনৈতিক দলের কাছে নিয়ে গেল। কিন্তু একমাত্র রদ্রিগো দুতার্তে ছাড়া আর কেউ তাকে পাত্তা দিল না। দুতার্তে ছিলেন একজন বাইরের লোক, যিনি সোশ্যাল মিডিয়াকে ক্ষমতায় যাওয়ার একটা নতুন পথ হিসেবে দেখেছিলেন। নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে দুতার্তের সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি ছিল মাদক ব্যবসাকে সমূলে উৎপাটন করা। তিনি এমনকি গর্ব করে বলতেন, দেশের একেবারে দক্ষিণের শহর দাভাওয়ের মেয়র থাকার সময় তিনি নিজে মোটরসাইকেলে করে ঘুরে ঘুরে মাদক ব্যবসায়ীদের গুলি করে মারতেন। সেই সময় 'পি' কলেজে পড়ত। সে ১৯২০ সালের 'লিটল আলবার্ট' এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে লেকচার শুনত, যেখানে একটা ছোট বাচ্চাকে যখনই একটা সাদা ইঁদুর দেখানো হতো, তখনই ভয়ংকর সব শব্দ শোনানো হতো। এর ফলে বাচ্চাটা সব লোমশ প্রাণীকেই ভয় পেতে শুরু করেছিল। 'পি' বলে, এই এক্সপেরিমেন্টটাই তাকে দুতার্তের ক্ষেত্রে একই রকম কিছু করার আইডিয়া দিয়েছিল।

প্রথমে সে বিভিন্ন শহরের নামে বেশ কয়েকটা ফেসবুক গ্রুপ খুলল। আপাতদৃষ্টিতে গ্রুপগুলো বেশ নিরীহ ছিল, শুধু শহরের টুকিটাকি খবর আর আলোচনা। আসল চালাকিটা ছিল গ্রুপগুলোর নাম আর ভাষা স্থানীয় উপভাষায় রাখা, ফিলিপাইনে এরকম কয়েকশো উপভাষা আছে। ছয় মাসের মধ্যেই প্রত্যেকটা গ্রুপের সদস্য সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে গেল। এরপর তার লোকেরা প্রতিদিন অন্তত একটা করে স্থানীয় অপরাধের খবর পোস্ট করতে শুরু করল। ইন্টারনেট ট্রাফিকের ব্যস্ততম সময়ে এই পোস্টগুলো করা হতো। অপরাধের খবরগুলো সত্যি ছিল, কিন্তু 'পি'-এর লোকেরা এরপর সেই খবরের সাথে মাদকের যোগসূত্র টেনে কমেন্ট করা শুরু করত। কেউ লিখত, 'শুনলাম খুনি নাকি একজন মাদক ব্যবসায়ী,' আবার কেউ লিখত, 'বেচারা একজন মাদক কারবারির শিকার হলো।' এক মাস পর তারা দিনে দুটো করে খবর পোস্ট করতে শুরু করল, আর তার পরের মাসে দিনে তিনটে।

মাদক নিয়ে অপরাধের খবরগুলো হট টপিক হয়ে উঠল, আর দুতার্তে জনমত জরিপে অনেকটা এগিয়ে গেলেন। 'পি' বলে, ঠিক তখনই টিমের অন্য পিআর লোকেদের সাথে তার ঝামেলা হয় আর সে কাজ ছেড়ে অন্য একজন প্রার্থীর সাথে যোগ দেয়। এই প্রার্থী আবার ভয়ের চেয়ে অর্থনৈতিক দক্ষতার ওপর বেশি জোর দিচ্ছিলেন। 'পি'-এর দাবি, সে এই প্রার্থীর রেটিং পাঁচ পয়েন্টের বেশি বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তখন আর স্রোত ঘোরানোর উপায় ছিল না, আর দুতার্তে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে গেলেন। এখন সে দেখে, যে-কেউই দুতার্তেকে জেতানোর কৃতিত্ব নিচ্ছে, আর এতে তার খুব রাগ হয়।

এই পেশায় যারা কাজ করে, তাদের ইন্টারভিউ নেওয়ার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, তারা সবসময় নিজেদের কাজকে অনেক বাড়িয়ে বলে। এটা তাদের পেশারই একটা অংশ। 'পি' কি সত্যিই দুতার্তেকে 'তৈরি' করেছিল? অবশ্যই না। মাদক নিয়ে মানুষের মনে ভয় ঢোকানোর পেছনে আরও অনেক কারণ ছিল, যার মধ্যে দুতার্তের নিজের কথাবার্তাও কম দায়ী ছিল না। আর শুধু মাদক নিয়ে কড়াকড়িই যে দুতার্তের একমাত্র বিক্রির জায়গা ছিল, তা-ও নয়। আমি এমন অনেক সমর্থকের সাথে কথা বলেছি, যারা 'ইম্পেরিয়াল ম্যানিলা'র এলিট শ্রেণি আর ক্যাথলিক চার্চের রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়া একজন সাধারণ মানুষের ইমেজে আকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু 'পি' যেভাবে ডিজিটাল প্রভাবের কথা বলেছে, তার সাথে কিছু অ্যাকাডেমিক স্টাডির বেশ মিল পাওয়া যায়।

ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটসের ডক্টর জোনাথন কর্পাস ওং আর লিডস ইউনিভার্সিটির ডক্টর জেসন কাবানেস টানা বারো মাস ধরে 'আর্কিটেক্টস অব নেটওয়ার্কড ডিসইনফরমেশন' নামে একটা গবেষণা করেছেন। এই গবেষণায় তারা ম্যানিলার সেই সব 'ডিসইনফরমেশন আর্কিটেক্ট' বা ভুয়া তথ্যের কারিগরদের সাথে কথা বলেছেন, যাদের দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলই কাজে লাগাত। ওং যাদের 'চিফ আর্কিটেক্ট' বলেছেন, তারা ছিল সবার ওপরে। এরা মূলত অ্যাডভার্টাইজিং আর পিআর ফার্ম থেকে আসত, গগনচুম্বী দালানের বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে থাকত। তারা নিজেদের কাজ নিয়ে এমনভাবে কথা বলত, যেন তারা গেম অফ থ্রোনস বা কোনো ভিডিও গেমের চরিত্র। তারা ওংকে বলত, 'ধরা পড়ে গেলেই তো খেলা শেষ।' খুব সাধারণ পরিবার থেকে এসে এই পেশার চূড়ায় পৌঁছাতে পেরে তারা বেশ গর্বিত ছিল। ওং-এর মতে, এই 'ডিসইনফরমেশন আর্কিটেক্ট'রা জনসাধারণের

প্রতি তাদের কোনো দায়িত্ব থাকার কথা অস্বীকার করে, আর তার বদলে নিজেদের ক্ষমতায়নের একটা গল্প ফাঁদে।

এই আর্কিটেক্টদের নিচেই ছিল 'ইনফ্লুয়েন্সার'রা। এরা মূলত অনলাইনে কমেডি করত। নতুন জোকস পোস্ট করার ফাঁকে ফাঁকে এরা টাকার বিনিময়ে বিরোধী দলের রাজনীতিবিদদের নিয়ে হাসাহাসি করত।

আর এই ডিসইনফরমেশন আর্কিটেকচারের সবচেয়ে নিচে, মানে একেবারে বস্তি এলাকায় যারা কাজ করত, ওং তাদের নাম দিয়েছিলেন 'কমিউনিটি-লেভেল ফেক অ্যাকাউন্ট অপারেটরস'। এরা কল সেন্টারে চব্বিশ ঘণ্টা শিফটে কাজ করত, ঘণ্টার হিসেবে টাকা পেত। একজন মানুষ একাই ডজন খানেক ভুয়া সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট চালাত। এদের মধ্যে অনেকেই ছিল সাধারণ মানুষ, যাদের হয়তো একটু বাড়তি টাকার দরকার ছিল (যেমন ছাত্র বা নার্স), আবার অনেকেই ছিল কোনো রাজনৈতিক দলের ক্যাম্পেইন স্টাফ। ওং রিনা নামের এমন একজন অপারেটরের ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন, যে একটা মেয়র ক্যাম্পেইনে যোগ দেওয়ার পর এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। সে অনেক আদর্শ নিয়ে কাজে যোগ দিয়েছিল, ইউনিভার্সিটিতেও ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া ছাত্রী ছিল। কিন্তু তাকে বলা হয়েছিল, অনলাইনে অনেকগুলো ফেক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে (বিকিনি পরা মেয়েদের ছবি দিলে কাজ ভালো হতো), অনলাইনে বন্ধু বানাতে হবে, নিজের প্রার্থীর গুণগান গাইতে হবে আর বিরোধী দলের নামে আজেবাজে কথা ছড়াতে হবে। রিনা নিজের কাজের জন্য খুব লজ্জিত ছিল। সে ইচ্ছে করেই নিজের কাজের ক্ষতি করত, সারাদিনে মাত্র কুড়ি জন ফেসবুক ফলোয়ার জোগাড় করত, যেখানে তার সহকর্মীরা শত শত ফলোয়ার নিয়ে আসত।

ওং খেয়াল করে দেখেছেন, এই ব্যবসার কোনো স্তরের মানুষই নিজেদের কাজকে 'ট্রলিং' বা 'ফেক নিউজ' ছড়ানো বলে স্বীকার করত না। সবারই নিজেদের বাঁচানোর কোনো না কোনো যুক্তি ছিল। আর্কিটেক্টরা বলত, এটা তাদের আসল পিআর কাজের পাশাপাশি একটা সাইড বিজনেস মাত্র, তাই এই কাজ দিয়ে তাদের বিচার করা উচিত নয়। আর তাছাড়া, পুরো রাজনৈতিক প্রচারণার দায়িত্ব তো তাদের হাতে ছিল না। কমিউনিটি-লেভেলের অপারেটররা বলত, আসল জঘন্য আর বিদ্বেষপূর্ণ কমেন্টগুলো অন্য কেউ করত। যাই হোক, অনলাইনে প্রভাব খাটানোর এই পুরো সিস্টেমটাই দুতার্তে ক্ষমতায় আসার পর আরও বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিল।

দুতার্তে শপথ করে বলেছিলেন, তিনি এত মাদক ব্যবসায়ীকে খুন করবেন যে ম্যানিলা উপসাগরের মাছেরা তাদের খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে যাবে। আর তিনি মজা করে বলতেন, তিনি নাকি নিজেই নিজেকে ক্ষমা করার একটা দলিলে সই করে রাখবেন। তিনি একবার শুধু 'তাকানোর' কারণে একজনকে খুন করার বড়াই করেছিলেন, আর বলেছিলেন যে মাদক ব্যবসায়ীদের জীবনের কোনো দামই তাঁর কাছে নেই। এখন বিভিন্ন গ্যাং আর পুলিশ যাকে-তাকে মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত সন্দেহে গুলি করে মারতে শুরু করল। এই অভিযানে ঠিক কত মানুষ মারা গেছে, তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর হিসেবে সংখ্যাটা ১২,০০০, বিরোধী দলের মতে ২০,০০০, আর সরকারের হিসেবে ৪,২০০। এমন একটা সময় ছিল যখন দিনে গড়ে ৩৩ জন করে খুন হতো। নিহতেরা সত্যিই দোষী কি না, তা কেউ যাচাই করে দেখত না। আর প্রায়ই এমন খবর আসত যে, মৃত্যুর পর নিহতের গায়ে মাদক গুঁজে দেওয়া হয়েছে। ৫৪ জন শিশুকেও এই অভিযানে হত্যা করা হয়েছিল। ম্যানিলার বস্তির গলিগুলো লাশে ভরে গিয়েছিল। মোটরসাইকেলে করে এসে লোকজনের মাথায় গুলি করে পালিয়ে যেত খুনিরা। জেলখানাগুলো মুরগির খামারের মতো গাদাগাদি হয়ে গিয়েছিল। সেনেটর লিলা ডি লিমা, যিনি এই হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন, হঠাৎ করেই নিজেকে বিচারের কাঠগড়ায় আবিষ্কার করলেন। জেলে থাকা মাদক সম্রাটরা তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল যে, তিনি তাদের ব্যবসার সাথে জড়িত। অনলাইনে একটা পুরো দল তাঁর গ্রেফতারের দাবিতে সরব হয়ে উঠল। এমন এক বিচারের অপেক্ষায় তাঁকে জেলে পোরা হলো, যে বিচার কোনোদিনই শুরু হয়নি। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তাঁকে 'প্রিজনার অফ কনসায়েন্স' বলে ঘোষণা করল। দেশের আর্চবিশপ যখন এই হত্যাযজ্ঞের নিন্দা করলেন, তখন সেই অনলাইন বাহিনী তাঁর ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়ল। এরপর এল মিডিয়ার পালা। সেই সব 'প্রেস্টিটিউট' বা সাংবাদিক, যারা প্রেসিডেন্টকে খুনি বলার সাহস দেখিয়েছিল।

আর এই সরকারের সবচেয়ে বড় টার্গেট ছিলেন মারিয়া রেসা, নিউজ ওয়েবসাইট 'র‍্যাপলার'-এর প্রধান। ব্যাপারটা বেশ মজার ছিল, কারণ এই মারিয়া আর র‍্যাপলারই একসময় অজান্তেই দুতার্তেকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছিল।

#Arrest MariaRessa!

মারিয়ার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলার পর আমি বুঝতে পারলাম, নিজেকে নিয়ে কথা

বলতে তিনি কতটা অস্বস্তিবোধ করছিলেন। তিনি এতটাই ভদ্র ছিলেন যে, সরাসরি এই কথা আমাকে বলতে পারলেন না। কিন্তু আমি খেয়াল করলাম, তিনি বারবার ইন্টারভিউয়ের মোড় নিজের দিক থেকে ঘুরিয়ে তাঁর সাংবাদিকদের কাজ আর অন্যদের জীবনের নানা নাটকীয় ঘটনার দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পুরো ক্যারিয়ার জুড়েই তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন, যিনি অন্যদের খবর সংগ্রহ করেছেন। প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সিএনএন ব্যুরোর প্রধান হিসেবে, তারপর ফিলিপাইনের সবচেয়ে বড় টেলিভিশন নেটওয়ার্কের হেড অফ নিউজ হিসেবে, আর শেষমেশ র‍্যাপলার-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও হিসেবে। আর এখন শুধু আমিই যে মারিয়াকে তাঁর অফিসে বসে ইন্টারভিউ নিচ্ছিলাম, তা নয়। তিনি যখন তাড়াহুড়ো করে পিনাট বাটার আর টিনজাত সার্ডিন মাছের স্যান্ডউইচ (যা ফিলিপাইনের একটা বিশেষ খাবার) গিলছিলেন, তখন কাতারের টিভি চ্যানেল আল জাজিরার ইংরেজি ভার্সনের একটা ডকুমেন্টারি টিমও তাঁর পিছু নিয়েছিল। তারা দুতার্তে আর ভুয়া খবরের বিরুদ্ধে মারিয়ার লড়াইয়ের ওপর একটা তথ্যচিত্র বানাচ্ছিল।

আল জাজিরার টিম জিজ্ঞেস করল, তারা আমার মারিয়াকে ইন্টারভিউ নেওয়ার দৃশ্যটা ক্যামেরাবন্দি করতে পারবে কি না। তারা যখন তাদের বিশাল ক্যামেরা নিয়ে ঘরের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসল, আমার কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল। আমিও তো সেই মানুষগুলোর দলে, যারা অন্যদের পর্যবেক্ষণ করে আর ভিডিও এডিট করে। তাই যখন কেউ আমাকে তাদের কাজের বিষয়বস্তু বানায়, তখন আমার বারবার মনে হতে থাকে, পরে এডিটের সময় তারা আমাকে কীভাবে কাটছাঁট করবে আর নতুন করে কীভাবে তুলে ধরবে। নিজে যখন ডকুমেন্টারি প্রডিউসার হিসেবে কাজ করতাম, তখন আমি একটা জিনিস খুব ভালো শিখেছিলাম। যাদের ভিডিও করতাম, তাদের এমন একটা অনুভূতি দিতাম যেন তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ, খুব স্পেশাল, এমনকি ওই মুহূর্তের জন্য হয়তো একটু অমরও বটে। কিন্তু আমি ভালো করেই জানতাম, পরে এডিটের সময় ওই পুরো ব্যাপারটা আমার হাতের মুঠোয় থাকবে। আমি যেভাবে চাইব, ঠিক সেভাবেই গল্পটা সাজাব। হয়তো শেষমেশ যে গল্পটা দাঁড়াবে, সেটা সত্যি হবে। কিন্তু একজন মানুষ নিজেকে যেভাবে দেখে আর তাকে ক্যামেরায় যেভাবে তুলে ধরা হয়—এই দুটোর মধ্যে প্রায়ই একটা কষ্টকর ফারাক থেকে যায়। এডিটের টেবিলে বানানো বাস্তবতা আর সেই মানুষের নিজের চোখে দেখা বাস্তবতার মধ্যে অনেক অমিল থাকে। ম্যানিলার সেই দিনটায় আমি নিজেকে এই ভেবে সান্ত্বনা দিলাম যে, আল জাজিরার ওই টিমকে নিয়ে

আমি আমার এই বইয়ে লিখব। আর এভাবেই আমি আবার গল্পের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে তুলে নেব।

তো এই ছিল অবস্থা—এক দল সাংবাদিক আরেক দল সাংবাদিকের ভিডিও করছিল, যারা আবার তৃতীয় আরেকজন সাংবাদিকের ইন্টারভিউ নিচ্ছিল। সাংবাদিকদের কাজ হলো বাস্তবতার খবর দেওয়া, যেখানে যা ঘটছে সেটা তুলে ধরা। কিন্তু মারিয়ার নিজের গল্প থেকেই বোঝা যায়, এখন তথ্য বা ইনফরমেশন নিজেই একটা বড় খবরের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মারিয়ার আদি বাড়ি ম্যানিলায়। কিন্তু তার বয়স যখন দশ বছর, তখন তার মা পুরো পরিবার নিয়ে আমেরিকায় পাড়ি জমান। নিউ জার্সির এলিজাবেথ শহরে মারিয়াই ছিল সবচেয়ে ছোট আর সবচেয়ে শ্যামলা মেয়ে। কিন্তু সে এতটাই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছিল যে, তাদের পরিবার থেকে প্রথমবার সে-ই প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ পায়। পলিটিক্যাল থিয়েটার নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য ১৯৮৬ সালে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে সে আবার ফিলিপাইনে ফিরে আসে। কিন্তু দেশে ফিরেই সে বুঝতে পারে, সে একেবারে মার্কোস-বিরোধী বিপ্লবের মাঝখানে এসে পড়েছে। আসল রাজনৈতিক নাটকটা তখন রাস্তার বুকেই মঞ্চস্থ হচ্ছিল। সিএনএন যখন কেবল একটা ছোটখাটো মার্কিন কেবল চ্যানেল, আর বিশ্বের প্রথম গ্লোবাল নিউজ নেটওয়ার্ক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে, ঠিক তখনই মারিয়া সেখানে যোগ দেয়। সিএনএন-এ অন-স্ক্রিন রিপোর্টাররাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কোন খবর কভার করা হবে, কখন হবে আর কীভাবে হবে—এই সবকিছু তারাই ঠিক করত। মারিয়াও সেই ক্ষমতাটা চেয়েছিল, কিন্তু ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে তার বড্ড অনীহা ছিল। এর একটা বড় কারণ হলো, সে সারা জীবন অ্যাকজিমা রোগে ভুগেছে। তাই ক্যামেরার সামনে যাওয়ার আগে তাকে একগাদা মেকআপ আর নানা কায়দাকানুন করতে হতো। কিন্তু ক্যামেরা আবার মারিয়াকে দারুণ ভালোবাসত। তার মধ্যে কোনো ভণিতা ছিল না। একটা বাচ্চা কুকুরের মতো তার অফুরন্ত উৎসাহ আর কৌতূহলে ভরা বড় বড় চোখ দুটো ক্যামেরায় খুব সুন্দর লাগত।

নব্বইয়ের দশকে মারিয়া ওই অঞ্চলে সিএনএন-এর মুখ হয়ে উঠেছিল। মার্কোসের পতনের পর একের পর এক স্বৈরাচারী সরকারের পতন হচ্ছিল, আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে ‘গণতন্ত্রের’ হাওয়া বইছিল, তার গল্প মারিয়াই শোনাচ্ছিল। অনেকেই তখন পুরো ব্যাপারটা স্নায়ুযুদ্ধের জয়ের চশমা দিয়ে দেখছিল। মনে হচ্ছিল যেন